الشرك الأصغر
ছোট শির্ক

ভূমিকাঃ ইতি পূর্বে লেভেল-২-তে বড় শির্ক ও তার প্রকার বিষয়ক শিক্ষা দে'য়া হয়েছে।
লেভেল-৩-তে ছোট শির্ক ও তার প্রকার সহ অন্যান্য বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে।

ছোট শির্কের সংজ্ঞা ঃ তা হল এমন শির্ক শরীয়তের দলীলে যাকে শির্ক বলা হয়েছে; কিন্তু উহা বড় শির্কের পর্যায়ে পৌঁছে না। ইবনু সা'দী (রাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক কথা, কর্ম ও ইচ্ছা যার মাধ্যমে বড় শির্কের পর্যায়ে পৌঁছা যায়, অথচ তা ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত না, তা হল ছোট শির্ক।

الخلاف في ضا بط الشرك الأصغر

ছোট শির্কের সংজ্ঞায় মতভেদ ঃ

১ম মত: যাকে শির্ক বলা হয়েছে, অথচ দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, উহা বড় শির্ক নয়। যেমন ঃ
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

من حلف بغير الله فقد أشرك

''যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল, সে শির্ক করল''। (আবু দাউদ, তিরমিজী)
আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা ছোট শির্ক। কেননা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা যদিও শির্ক কিন্তু তা শপথকারীকে ইসলামের সীমা হতে বের করে দেয়না।

২য় মত: ছোট শির্ক হল বড় শির্কের মাধ্যম, যদিও তাকে শির্ক নামে অভিহিত করা না হয়। যেমন, মানুষ কোন কিছুর উপর শুদ্ধ বা প্রকৃত ভরসা করে, যেমনটি ভরসা কেবল আল্লাহ্র উপর করা উচিত। অর্থাৎ উপায় অবলম্বের উপর আল্লাহ্র উপর ভরসার ন্যায় ভরসা করা। কিন্তু যদি অশুদ্ধ ভরসা করে, তবে তা বড় শির্কের পর্যাভুক্ত হবে। যেমন, মৃত ব্যক্তির প্রতি কোন ভরসা করা, যে ভরসা কেবল আল্লাহ্র উপর করা উচিত।

حكم الشرك الأصغر

ছোট শির্কের বিধান ঃ

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেন, কোন শির্কই আল্লাহ (তওবা ছাড়া) ক্ষমা করবেন না, যদি তা ছোট শির্ক ও হয় না কেন। যেহেতু আল্লাহর ঘোষণা ব্যাপক অর্থবোধক।

ان الله لاَ يَغْفِرُ اَنْ يشْرَكَ به (النساء أية ١١٦)

অর্থাৎ - "নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমা করবেন না, তাঁর সাথে শির্ক করা" (সূরা নিসাঃ আয়াত ১১৬)

কতিপয় বিদ্বান বলেন ঃ ছোট শির্ক আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কেননা পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত শির্ক হতে বড় শির্ক উদ্দেশ্য। ছোট শির্ক (তওবাহ্ ছাড়া) ক্ষমার পর্যায় ভূক্ত। কেননা, উক্ত শির্ক করা শির্ককারীকে ধর্মের সীমা হতে বের করে দেয় না। আর যে সকল পাপ পাপীকে ধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন করে না তা আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন,চাই তিনি তা ক্ষমা করতে পারেন, না ও করতে পারেন। যাহোক, ছোট শির্ককারীও ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন। উক্ত পাপটি কবীরা গুনাহ্ সমূহের শীর্ষ পর্যায়ভুক্ত। ইবনু মাস্উদ (রাঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ্র নাম নিয়ে মিথ্যা শপথ করা আমার নিকট সহজ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে সত্য শপথের চেয়ে'। (কেননা আল্লাহ্র নামে মিথ্যা শপথ সাধরণ কবীরা গুনাহ্র অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে সত্য শপথ ও ছোট শির্কের পর্যায়ভুক্ত। যা কবীরা গুনাহ্র শীর্ষ স্থানীয় অপরাধ)। (তাবারানি, মুছান্নাফ আবদুর্ রাজ্জাক, আল্-হাইছামী)

أنواع من الشرك الأ صغر

ছোট শির্কের প্রকার সমূহ ঃ

(ক) আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা ঃ

যেমন-বাপ-দাদার শপথ, মূর্তি-প্রতিমার শপথ, কাবার শপথ, মসজিদের শপথ, সন্তানের শপথ, আমানতের শপথ ইত্যাদি।

রাসূল সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল, সে কুফরী করল, অথবা শির্ক করল। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, শির্ক করল'। (আবু দাউদ, তিরমিজী, আহ্মদ, হাকেম)

রাসুল সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন ঃ

'তোমরা তোমাদের পিতা -মাতা এবং বাতিল শরীক সমূহের নামে শপথ কর না'। (আবু দাউদ, নাসায়ী)

(খ) স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে শব্দের মাধ্যমে বরাবর করা ঃ

যেমন- একথা বলা 'যা আল্লাহ্ চেয়েছেন এবং আপনি চেয়েছেন' বা একথা বলা 'যদি আল্লাহ্ না থাকত এবং সে ব্যক্তি না থাকত' ইত্যাদি। এর দলীল হল, একদা এক ইহূদী রাসুল সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, আপনারাও শির্ক করে থাকেন এবং বলে থাকেন 'আল্লাহ্ যা চান এবং তুমি যা চাও' এবং বলে থাকেন 'কাবার শপথ' অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমরা যদি শপথ করতে চাও তবে বলবে'কাবার প্রভূর শপথ' এবং বলবে 'যা আল্লাহ্ চান অতঃপর আপনি চান'। (নাসায়ী, আহম্মদ, হাকেম)

যে ব্যক্তি নবীজিকে বলেছিলেন, আল্লাহ্ যা চান এবং আপনি যা চান তাকে তিনি (সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন 'তুমি কি আমাকে আল্লাহ্র শরীক স্থাপন করলে, বরং তিনি একক ভাবে যা চান (তাই হয় বা করেন)। (বুখারী, ইবনু মাযাহ্, আহম্মদ, বায়হাকী)

উল্লেখিত বাক্য সমূহে (و) 'ওয়াও' অর্থ এবং (ثم) 'ছুম্মা' অর্থ অতঃপর এর মধ্যে শাব্দিক পার্থক্য হল, 'ওয়াও' ব্যবহৃত হলে তার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী শব্দের অর্থাৎ স্রাষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সামঞ্জস্য বোঝায়। আর (ثم) 'ছুম্মা' ব্যবহৃত হলে অনুগামী অর্থ বোঝা যায়। তা হলে অর্থ হয় সৃষ্টির ইচ্ছা স্রষ্টা (আল্লাহ্)র ইচ্ছার অনুগামী।

(গ) এ কথা বলা ঃ 'যদি অমুক না থাকত তা হলে এমন হত না' অথবা 'কোন কিছুকে তার অকারণের দিকে সম্পর্ক করা'।

ইহার ৩টি অবস্থা হতে পারে ঃ

(১) কোন কিছুকে গোপন কারণের দিকে সম্বন্ধ করা, প্রকৃত পক্ষে যার প্রভাব নেই। যেমন এ কথা বলা যদি 'অমুক ওলী না থাকত, তা হলে এটা হত না' এরকম বলা শির্ক।

(২) কোন কাজকে এমন কোন কারণের প্রতি সম্বন্ধ করা যার সঠিক প্রমাণ শরীয়তে বিদ্যমান। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু তালেবের জাহান্নামে অবস্থান সম্পর্কে বলেছেন ঃ

لولا أنا لكان في الدرك الأ سفل من النار – متفق عليه

'যদি আমি না থাকতাম তা হলে (আবূ তালেব) জাহান্নামের সর্ব নিম্নে অবস্থান করত'।

এরকম সম্বন্ধ করা তখন বৈধ, যখন সম্বন্ধকারী এ বিশ্বাস না রাখে যে, কারণ নিজেই প্রভাব ফেলতে সক্ষম এবং একথা ভুলে না যায় যে, এ কারণের জন্য একজন অনুগ্রহকারী রয়েছেন। অনুরূপভাবে 'আমার এ মাল-সম্পদ আমার পুর্ব পুরূষদের নিকট হতে উত্তরাধিকারী হিসাবে পেয়েছি' বলা বৈধ। 'কুকুরটি না থাকলে চোরটিকে আক্রমণ করতে পারতাম না' বলাও বৈধ ইত্যাদি।

(৩) কোন কাজকে কোন প্রকাশ্য কারণের প্রতি সম্বন্ধ করা। কিন্ত ঐকাজের কারণ হওয়ার ব্যাপারে কোন শারয়ী বিধান নেই। যেমন কেউ তা'বীজ ব্যবহার করে এবং বলে এটা আমাকে যাদু ও চোখ লাগা থেকে বাঁচায়। এরূপ বলা ও ভাবা ছোট শির্ক।

(ঘ) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর বান্দাহ্ অর্থে নাম রাখা। যেমন এরূপ নাম রাখা (عبد الكعبة) 'আবদুল কাবাহ্' অর্থ হল কাবাহ্র বান্দাহ্ বা দাস। অনুরূপ ভাবে (عبدالنبى) 'আবদুন্ নবী' নবীর বান্দাহ্, (عبد المطلب)'আবদুল মুত্তালিব' মুত্তালিবের বান্দাহ্ (عبد مناف) 'আবদে মানাফ' মানাফের বান্দাহ্ ইত্যাদি।
এর দলীল হলো আল্লাহ্র ঘোষণা ঃ

فَلَما آتَهُمَا صَالحاً جَعَلاَ لَه شُرَ كَآءَ فِيمَآ ا تَهُمَا فَتَعلَى اللهُ (الاعراف-١٩٠)

অর্থ ঃ- অতঃপর তাদের যখন সুস্থ ও ভাল দান করা হল, তখন দানকৃত বিষয়ে তার অংশীদার তৈরী করতে লাগল। বস্তুত আল্লাহ্ তাদের শরীক সাব্যস্ত করা থেকে বহূ উর্দ্ধে (সুরা আল্ আরাফ ঃ ১৯০)

কিন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

أنا ابن عبد المطلب

'আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশের সন্তান'' (বুখারী) এবং আরো বলেন ঃ
يا بنى عبد مناف 'হে আব্দে মানাফের সন্তানগণ'। এসব বলা দ্বারা একথা প্রামাণিত হয় না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসবের স্বীকৃতি দিচ্ছেন বরং তা হতে বুঝা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পরিচিত নামের উল্লেখ পূর্বক সম্বোধন করেছেন।

এছাড়া যে কোন লোক তার নাম পিতার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করতে পারে, যদিও তার পিতার নাম আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের বান্দাহ্ অর্থবোধক হয় না কেন।

(ঙ) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য বা অন্যের দৃষ্টি অকর্ষণের জন্য কোন সামান্য কাজ করলে ও তা ছোট শির্কের পর্যায়ভূক্ত হয়।
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر

'তোমাদের উপর আমি সর্বাপেক্ষা ভয় করছি ছোট শির্ক সম্পর্কে'।

অতঃপর এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তা হল 'রিয়া' লোক দেখানো কর্ম বা ইবাদত। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ কোন মানুষ 'সালাত' আদায়ের জন্য দাঁড়াল, যখন দেখল লোকজন তাকে দেখছে তখন 'সালাতকে' আরও সুন্দরভাবে আদায় করে, (ইবনু মাযাহ, হাকেম) তা হল শির্কের অন্তর্ভূক্ত। কেননা উক্ত ব্যক্তি আল্লাহ্কে সন্তুষ্টি করা ছাড়া মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকেই তার ইবাদতের উদ্দেশ্যে পরিণত করেছে। কখনও এমন কাজ বড় শির্কের পর্যায় পৌঁছতে পারে।
যে ইবাদত 'রিয়া' মিশ্রিত হয় তা তিন প্রকার ঃ

প্রথম প্রকার ঃ ইবাদত মূলতঃ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেই করা হয়। যেমন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য 'সালাত' আদায় করা। ইহা শির্ক এবং এ প্রকার ইবাদত বাতিল।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ ইবাদত করার মধ্যবর্তী অবস্থায় 'রিয়ায়' পতিত হওয়া। অর্থাৎ- যেমন ইবাদত শুরুর সময় মুখলিছভাবে আরম্ভ করে কিন্ত ইবাদতের মধ্যবর্তী সময়ে 'রিয়া' মিশ্রিত হয়। এ অবস্থায় ইবাদতের প্রকারভেদ অনুযায়ী তার হূকুম নির্ধারিত হবে।

(১) **যদি দ্বিতীয় ইবাদতটি ১মটির উপর ভিত্তিশীল না হয় তবে প্রথমটি শুদ্ধ হবে আর দ্বিতীয়টি বাতিল হয়ে যাবে।** এর উদাহরণ হল, যেমন কোন ব্যক্তি একশত রিয়াল দান করল ইখলাছের সাথে, আরও একশত রিয়াল দান করল লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে, এমতাবস্থায় প্রথম একশত রিয়াল দানটি শুদ্ধ হবে। আর দ্বিতীয় একশত রিয়াল দানটি বাতিল হয়ে যাবে।

(২) যদি ইবাদতটির শেষাংশ প্রথমাংশের উপর ভিত্তিশীল হয় তবে এর দুটি অবস্থা ঃ

(ক) ইবাদতকারী ব্যক্তি 'রিয়াকে' প্রতিহত করবে এবং 'রিয়ার' উপর স্থির হবে না। যেমন কোন ব্যক্তি 'সালাতে' দঁড়াল মুখলিছভাবে কিন্ত দ্বিতীয় রাকাত কালীন স্বীয় অন্তরে 'রিয়া' অনুভব করল, অতঃপর 'সালাত' আদায়কারী স্বীয় অন্তরে রিয়া অনুভব করতে থাকল, এমতাবস্থায় 'রিয়া' ইবাদতে কোন প্রকার প্রভাব ফেলবে না, অথবা কোন ক্ষতিও করবে না।

(খ) অপর অবস্থাটি হল ঃ ইবাদতকারী 'রিয়ার' প্রতি তুষ্ট থাকবে এবং 'রিয়া'কে অন্তরে প্রতিহত করবে না। এমতাবস্থায় তার পূর্ণ ইবাদতটি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা ইবাদতের শেষাংশ প্রথমাংশের উপর ভিত্তিশীল। যেমন কোন ব্যক্তি 'সালাতে' দাঁড়াল ইখ্লাছের সাথে, অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতে সে যখন লক্ষ্য করল মানুষ তার 'সালাতের' দিকে দৃষ্টি দিয়েছে, তখন তার অন্তরে 'রিয়া'র উদয় হল এবং 'সালাত' রত উক্ত ব্যক্তি 'রিয়া'র প্রতি তুষ্ট থাকল (অন্তরে 'রিয়া'কে প্রতিহত করল না) এমতাবস্থায় পূর্ণ 'সালাত' বাতিল হয়ে যাবে। কেননা 'সালাতের' শেষাংশের সাথে প্রথমাংশ সম্পৃক্ত রয়েছে।

তৃতীয় প্রকার ঃ ইহা হল ইবাদত সমাপ্ত করার পর যদি ইবাদতকারীর অন্তরে 'রিয়া'র উদ্ভব ঘটে, তবে তা ইবাদতে কোন প্রকার প্রভাব ফেলবে না। কিন্ত যদি ইবাদতের সাথে সংঘর্ষকারী কিছু করে তবে ইবাদতটি বাতিল হয়ে যাবে। যেমন দান খয়রাত করার পর দান গ্রহণকারীকে খোঁটা দেয়া, গঞ্জনা করা বা এ প্রকার কোন দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি দেয়া।

দ্রষ্টব্য ঃ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো 'রিয়া'র অন্তর্ভূক্ত নয়।

(১) সুন্দর পোষাক পরিঁধান করা বা মানুষের সম্মুখে সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা ।
(২) পাপ গোপন করা বা তা প্রকাশ না করা।
(৩) ইবাদতকারীকে দেখে ইবাদতের প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাওয়া।
(৪) কোন কাজ ইখলাছের সাথে করার পর মানুষ তার প্রশংসা করলে খুশী হওয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ تلك عاجل بشرى المؤمن 'ইহা মু'মিনদের আশু শুভ সংবাদ'।
(৫) যদি কেউ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ইখলাছের সাথে কোন কর্ম সম্পাদন করে, অতঃপর উক্ত কাজের জন্য অর্থ সম্পদ গ্রহণ করে। যেমন কোন মুজাহিদকে গণীমতের সম্পদ হতে বা নির্ধারিত বেতন-ভাতা প্রদান করা হয় বা আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানকারী (দায়ী) কিছু অর্থ-কড়ি ভাতা হিসাবে গ্রহণ করে, যা তার ধর্মীয় দাওয়াতের জন্য সহায়ক। এরকম বেতন-ভাতা গ্রহণ কোন ক্ষতি করে না। কেননা এব্যক্তি তার কর্ম দ্বারা দ্বীনের খিদমত করছে, আর তার ভাতা যা গ্রহণ করছে তা তার দ্বীনী কর্মে সহায়ক।

এজন্যই যাঁরা ধর্মীয় ও পার্থিব কল্যাণ করেন, তাঁদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা ইসলামী শরীয়তে বিধান রেখেছেন, যেন তারা যাকাত ও যুদ্ধলভ্য সম্পদ (গণীমাত) হতে একটি বিরাট অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

আর যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও পার্থিব উন্নতির উদ্দেশ্যে কোন কর্ম সম্পাদন করে এবং উক্ত উভয় বিষয়ের উদ্দ্যেশ্যই সমান থাকে, তবে উক্ত ব্যক্তির আমলটি ত্রুটিপুর্ণ হবে। কেননা সে ব্যক্তির নিয়্যাতে পুর্ণ ইখলাছ নেই এবং তার ঈমানও অসম্পুর্ন।

আর যদি কেউ শুধু দুনিয়ার উদ্দেশ্যে কর্ম করে, তা হলে ঐ ব্যক্তির জন্য পরকালে পাবার কিছুই থাকবে না। আর এ ধরণের উদ্দেশ্যে কোন কর্ম মুমিন ব্যক্তি হতে হয় না।

(৬) ইবাদতের সাথে অন্য কোন উদ্দেশ্য মিলিত করণ ঃ

যেমন কেউ জিহাদ করে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও গণীমাতের সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্যে। অথবা হজ্ব করার সাথে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য একত্রিত করে, বা সিয়াম পালন করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে। এসকল উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন সৃষ্ট জীব বা বস্তুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় না, বরং ইবাদতের সাথে কিছু কল্যাণকর বিষয়কে একত্রিত করা হয়েছে। এসকল উদ্দেশ্য একত্রিত করার ফলে কখনও সওয়াব কম হতে পারে। আর যদি ইবাদত এসব বিষয় মুক্ত হয় তখন সওয়াব আরো অধিক হবে।

(৭) কোন ব্যক্তি যদি এমন কিছু করে যা দেখে লোকজন অনুসরণ করতে পারে, তবে ঐ কাজটি রিয়ার অন্তর্ভূক্ত হবে না। বরং তা এক ধরণের দাওয়াতের অন্তর্ভূক্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

فعلت هذا لتأتموا بى و تعلموا صلاتى (متفق عليه)

''আমি এরূপ করলাম যেন তোমরা আমার অনুসরণ করতে পার এবং আমার সালাত শিক্ষা গ্রহণ করতে পার''। (মুত্তাফাক আলাইহি)

কর্মের মাধ্যমে পার্থিব উদ্দেশ্য অর্জনের স্বরূপ নির্নয়কারী কতিপয় উদাহরণ ঃ

(১) **শুধু অর্থ-সম্পদ অর্জন উদ্দেশ্য করা ঃ** যেমন কেউ আজান দেন শুধু বেতন পাওয়ার জন্য অথবা বদলী হজ্ব করেন টাকা অর্জনের জন্য ইত্যাদি।

(২) **শুধু মর্যাদা অর্জনের জন্য কিছু করা ঃ** যেমন কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে শুধু সার্টিফিকেট অর্জনের লক্ষ্যে যেন এর মাধ্যমে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

(৩) **কষ্ট, বিপদ বা অসুস্থতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যইবাদত করা ঃ** যেমন কেউ ইবাদত করে যেন এর বিণিময়ে আল্লাহ্ তার কষ্ট দূর করে দেন, বা বিপদ হতে রক্ষা করে বা রোগমুক্ত করেন ইত্যাদি।

(৪) জনপ্রিয়তা ও মানুষের ভালবাসা পাবার উদ্দেশ্যে ইবাদত করা ঃ

কিছু কাজ আছে যা সূক্ষ্ম রিয়ার পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা হয়। নিম্নে তার কিছু উপমা প্রদান করা হল।

(ক) যেমন কোন লোক আল্লাহ্‌র আনুগত্য (ইবাদত) গোপনে করছে এবং সে তা প্রকাশ করতে চায় না। কিন্ত যখন মানুষ জেনে যায়, তখন উক্ত আমলকারী চায় মানুষ যেন তাকে সম্মানের সাথে সালাম করে। তার সাথে হাঁসি মুখে যেন উত্তম আচরণ করে। (যেহেতু তিনি ইবাদতকারী) ইত্যাদি।

(খ) যেমন কোন মানুষ ইখলাছের সাথে কিছু কাজ করে এজন্য যে,সে যেন আলেম হতে পারে, বা জ্ঞানী হতে পারে, বা আধ্যাত্মিক হতে পারে, অথবা মানুষের সম্মান ও প্রশংসা অর্জন করতে পারে ইত্যাদি।এমন ব্যক্তি তার ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চায় না। বরং তার সামান্য উদ্দেশ্য সাধনে আল্লাহ্‌র ইবাদতকে মাধ্যম হিসাবে নির্ধারণ করেছে।

(গ) মানুষের সামনে নিজকে ভর্ৎসনা করা, যেন মানুষের নিকট সম্মান বৃদ্ধি পায় অথবা মানুষ তার প্রশংসা করে।

الفرق بين الشرك الخفى و الشرك الجلى

গোপন শির্ক ও প্রকাশ্য শির্কের মধ্যে পার্থক্য :

গোপন শির্ক ও প্রকাশ্য শির্কের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে কতিপয় আলেম বলেন : প্রকাশ্য শির্ক হল বড় শির্ক এবং গোপন শির্ক হল ছোট শির্ক। কিছু কিছু আলেম বলেন ঃ প্রকাশ্য শির্ক হল যা মানুষের নিকট প্রকাশ পায়, চাই তা বড় শির্কের পর্যায়ভুক্ত হউক বা ছোট শির্কের পর্যায়ভুক্ত হউক। যেমন আল্লাহ্ ছাড়া কারো নামে শপথ করা, অথবা কবরে সিজদা করা।

আর গোপন শির্ক হল যা মানুষের নিকট প্রকাশ না পায়। চাই বড় শির্ক হোক বা ছোট শির্ক । যেমন রিয়া এবং বিশ্বাস করা যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ আছে।

আরো বলা হয়ে থাকে, প্রকাশ্য শির্ক হল, যা কথা ও কর্মের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা। অথবা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সম্মানের জন্য মাথা নত করা। আর গোপন শির্ক হল যা হৃদয়ে ঘটে থাকে, যেমন রিয়া।

প্রশ্ন পত্র

১। ছোট শির্কের সংজ্ঞা দাও।
২। ছোট শির্কের বিধান কি? দলীলসহ লিখ।
৩। ছোট শির্কের প্রকারের মধ্য হতে দু'প্রকার শির্কের দলীল ও উদাহরণসহ উল্লেখ কর।
৪। ইবাদতের সাথে যখন রিয়া মিশ্রিত হয়, তার তিনটি অবস্থা, অবস্থাগুলো উল্লেখ কর।
৫। নিম্ন বর্ণিত কর্মগুলোর কোনটি রিয়া কোনটি রিয়া নয় উল্লেখ কর।

(ক) পাপকে গোপন করা (খ) মানুষকে অনুসরণ করানোর উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা (গ) সৎ কাজের বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করা (ঘ) সুন্দর পোষাক পরিধান করা (ঙ) মানুষের দৃষ্টি হতে আমল গোপন করা (চ) মানুষের সম্মুখে স্বীয় আত্মাকে ভর্ৎসনা করা (ছ) আনুগত্যের সাথে কিছু উদ্দেশ্য মিলানো।

৬। প্রকাশ্য ও গোপন শির্কের মধ্যে পার্থক্য কি?
৭।কোন কিছুকে তার অকারণের দিকে সম্বন্ধ করার তিনটি অবস্থা আছে তা উল্ল্যেখ কর।

الكفر
কুফরী

কুফরের সংজ্ঞা ঃ

আভিধানিক সংজ্ঞা ঃ ঢেকে দেয়া, গোপন করা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা ঃ ঈমানের বিপরীত হল কুফরী। তথা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে অবিশ্বাস। চাই এবিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বা এ বিষয়ে সন্দেহ সংশয়ের মাধ্যমে বা এ বিষয়ে বিমুখ থেকে বা হিংসা বিদ্বেষ করে বা অহংকারী ভাবে ইত্যাদি।

কুফরের প্রকার ঃ কুফরী দু'প্রকার।

১। كفر أكبر **বড় কুফরী- যা ঈমানের গন্ডি হতে কুফুরীকারীকে পূর্ণভাবে বের করে দেয়। তা হল বিশ্বাসে কুফরী করা।** অন্তরে যে বিশ্বাস রাখা বাঞ্চনীয় তার বিপরীত কিছু বিশ্বাস করা।

২। كفر أصغر **ছোট কুফরী- যা পূর্ণ ঈমানের পরিপন্থী ঃ যে কুফরী করার ফলে কোন ব্যক্তি ধর্মীয় গন্ডি বহির্ভূত হয় না। তা হল কর্মে কুফরী।** যা অন্তরে বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়। এগুলো এমন কিছু পাপ কর্ম যাকে কুরআন-হাদিসে কুফরী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্ত তা বড় কুফরীর পর্যায়ে পৌঁছে না।

أقسام الكفر الأكبر

বড় কুফরীর প্রকার সমূহ ঃ

(ক) অজ্ঞতা ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কুফরী ঃ যা ছিল প্রকাশ্যে ও গোপনে। কুরাইশদের অধিকাংশ, কাফেরগন এবং অন্যান্য অনেকে এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمن أظلَمُ ممنِ افتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أو كَذبَ بِالحَقِ لَما جآءه أَلَيسَ فِى جَهَنمَ مَثوًى للكفرين

অর্থ ঃ যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা গড়ে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর সত্যকে অস্বীকার করে, তার কি স্মরণ রাখা উচিত নয় যে, জাহান্নামই সে সব কাফেরের আশ্রয়স্থল হবে। (সুরা আনকাবুত ঃ ৬৮)

(খ) অস্বীকারকারী কুফরী ঃ তা হলো জেনে শুনে সত্যকে গোপন করা ও তাকে বাস্তবায়ন না করার মাধ্যমে। যেমনটি ছিল ফিরাউনের কুফরী এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ইহূদীদের কুফরী। আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلَما جَاءَ هُم ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ

অর্থ- অতঃপর যখন তাদের নিকট সেই পরিচিত কিতাব এল তখন তারা তাকে অস্বীকার করল। (সূরা বাকারা ঃ ৮৯)

(গ) হিংসা-বিদ্বেষ বশতঃ ও অহংকার, হটকারীতামূলক কুফরী ঃ তা হয়ে থাকে সত্যকে বাস্তবায়নের পর তাকে স্বীকার করা সত্বে ও কুফরী করার মাধ্যমে। যেমন কুফরী করেছিল ইব্লীস, অনুরুপ কুফরী করা। আল্লাহ্ বলেন ঃ

الا ابليس اَبِى وَاستَكبَروَ كَانَ مِنَ الكافِرِينَ

অর্থ- কিন্তু ইব্লীস (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল ও অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (সূরা বাকারা ঃ ৩৪)

(ঘ) নিফাকের কুফরীঃ তা হল ঈমান আনার পর প্রকাশ্য আমল বাস্তবায়ন করার পর যেমনটি ছিল (মুনাফিক) ইবনে সুলুল ও তার দোসরদের কুফরী। আল্লাহ্ বলেন ঃ

ذ لِكَ يأ نَهُم آمَنَوا ثُم كَفَرا ا فَطُبِعَ عَلى قُلُو بِهِم فَهُم لاَيَفقَهوُنَ

অর্থ- ইহা এজন্য যে তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে, ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে, পরিণামে তারা বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। (আল্-মুনাফিকুন ঃ ৩)

ছোট কুফরীর উদাহরণঃ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

سبا ب المسلم فسوق و قتاله كفر

অর্থ-কোন মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং কোন মুসলিমকে হত্যা করা কুফরী। (মুত্তাফাক আলাইহি)

রাসুল সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

من حلاف بغير الله فقد كفر أو أشرك

যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল, সে কুফরী করল বা শির্ক করল। (তিরমিজী, হাকেম)

النفاق

নিফাক করা

নিফাকের সংজ্ঞা ঃ نفق শব্দ হতে গৃহিত অর্থ ভূ-গভস্থ গর্ত যাতে লুকানো যায় ,পলায়ন করা যায়।

শারয়ী পরিভাষায় নিফাক হল মুখে ও কর্মে ইসলাম প্রকাশ করা এবং কুফরীকে গোপন রাখা। আল্লাহ্ তায়ালা মুনাফিকদেরকে কাফেরদের চেয়ে নিকৃষ্ট হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন ঃ

إن المُنافِقِينَ فِى الدرك الاَسفَلِ مِنَ النارِ

অর্থ - নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত (থাকবে)। (সুরা নিসা ঃ১৪৫)

নিকাফের প্রকার ঃ

নিকাফ দুই প্রকার ঃ যথা ১। বড় নিকাফ এবং ২। ছোট নিকাফ।

১। বড় নিকাফ- তা হল বিশ্বাসে নিকাফ। এ নিকাফে পতিত ব্যক্তি তারা, যারা ইসলাম প্রকাশ করা সত্বেও কুফরী ঢেকে রাখে। এমন ব্যক্তি ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত। তারা জাহানন্নামের সর্ব নিম্নে অবস্থান করবে। আল্লাহ্ তায়ালা সূরা বাকারার প্রথমাংশে তাদের কিছু বৈশিষ্ট উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে কুফরী,বিশ্বাসহীনতা, ধর্ম নিয়ে উপহাস, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন, মুসলমানদের সাথে শত্রুতা ইত্যাদি। সর্বযুগে সর্বত্রই তারা বিদ্যমান। তারা মুসলমানদের সাথেই বসবাস করে। তারা ঈমানের প্রকাশ করলেও বস্তুত তা তাদের রক্ত ও সম্পদ সংরক্ষণার্থে মাত্র। সত্যিকারার্থে তারা স্বীয় ঈমান বিষয়ে মিথ্যাবাদী।

২। ছোট নিকাফ ঃ তা হল কর্মে নিকাফ অর্থাৎ অন্তরে ঈমান থাকা সত্বেও মুনাফিকদের কর্ম সমূহ হতে কিছু কর্ম করা। এমন ব্যক্তি ইসলামের গন্ডিচ্যূত হয় না বটে, তবে ইহা গন্ডিচ্যূত হওয়ার মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا أتمن خان

অর্থ- মুনাফিকের চিহ্ন হল তিনটি। যখন কথা বলে তখন মিথ্য বলে। যখন প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তখন তা ভংগ করে। আর যখন তার কাছে কিছু আমানত রাখা হয় তা খেয়ানত করে। (মুত্তাফাক আলাইহি)

الفسق

ফাসেকী

ফিস্‌কের সংজ্ঞা ঃ

ফিসকের আভিধানিক অর্থ বের হওয়া।

শারয়ী পারিভাষিক অর্থ হল আল্লাহ্‌র আনুগত্য হতে বের হওয়া।

ফিসকের প্রকার ঃ

ফিস্‌ক দু প্রকার। ১। বড় ফিস্‌ক এবং ২। ছোট ফিস্‌ক।

১। বড় ফিস্‌ক- তা হল আল্লাহ্‌র আনুগত্য হতে পূর্নভাবে বের হয়ে যাওয়া। এমন ব্যক্তি মুসলিম জাতির গন্ডি হতে বেরিয়ে যায় এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হবে। যেমন কাফেরগণের আল্লাহ্‌র আনুগত্য হতে বের হয়ে যাওয়া।

আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন ঃ

وَاَما الذِينَ فَسَقُوا فمأوا هُمُ النارُ

অর্থ-আর যারা পাপাচার করেছে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম (সূরা সাজাদা ঃ ২০)

আল্লাহ্‌ তা'লা আরো বলেন ঃ

فَفَسَقَ عَن أمر رَبه

(সে ইবলীস) তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। (সূরা কাহ্‌ফ ঃ ৫০)

২। ছোট ফিস্‌ক ঃ তা হল আল্লাহ্‌র আনুগত্যের অংশ বিশেষ হতে বেরিয়ে যাওয়া। তা হল পাপ কার্য করা। এহেন পাপ মুসলিমকে ধর্মীয় গন্ডি হতে বের করে দেয় না এবং এমন পাপী চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হবে না। তাই মুসলমানদের মধ্যে কবিরা গুনাহ্‌কারীদেরকে ফাসেক হিসাবে নাম করণ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌ সোবহানাহু ওয়া তা'লা বলেন ঃ

فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَجِدَالَ فِى الحَج

অর্থ- হজ্জের মধ্যে সহবাস. পাপাচার ও কলহ করতে পারবে না। (সুরা আল্‌-বাক্বারা ঃ ১৯৭)

আল্লাহ্‌ সোবহানাহু ওয়া তা'লা আরো বলেন ঃ

يَا أيهاَالَذِينَا آ مَنُو إن جَآءَكُم فَاسِق بِنَبَاءٍ فَتَبَينُوا

অর্থ- হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে তা পরীক্ষা করে দেখবে। (সুরা হুজুরাত ঃ ৬)

الظلم

জুলুম

শরিয়তের বিধান মতে জুলুম দুপ্রকার।

১। বড় জুলুম (শির্ক)- যা মানুষকে ইসলামের সীমা হতে বের করে দেয় এবং এজাতীয় জুলুমকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হবে।
যেমন আল্লাহ্ সোবহানাহু ওয়া তা'লা বলেন ঃ

ان الشركَ لَظُلم عَظِيم

অর্থ- নিশ্চয়ই শির্ক চরম জুলুম। (সুরা লুকমান ঃ ১৩)
আল্লাহ্ সোবহানাহু ওয়া তা'লা আরো বলেন ঃ

وَلاَ تَدعُ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَينلفَعُكَ وَ لاَ يَضُركَ فإ ن فَعَلتَ فَإنكَ إذًامنَ الظالمينَ

অর্থ- আর আল্লাহ্কে ছেড়ে এমন বস্তুর বন্দেগী করনা, যা না তোমাদের কোন উপকার করতে পারে, না কোন ক্ষতি করতে পারে। বস্তুতঃ যদি এরূপ কর তবে তুমি এমতাবস্থায় জালিমদের (মুশরিকদের) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (সুরা ঃ ইউনূস-১০৬)

২। ছোট জুলুম- যা মানুষকে ইসলামের সীমা হতে বের করে না এবং এমন জুলুমকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হবে না।
যেমন আল্লাহ্ সোবহানাহু ওয়া তা'লা বলেন ঃ

وَلاَتُمسكُو هُن ضِرَارً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

এবং তাদেরকে (স্ত্রীদের) যন্ত্রনা দেয়ার জন্যে আবদ্ধ করে রেখ না, তা হলে সীমালংঘন করবে।আর যে ব্যক্তি এরূপ করে সে নিশ্চয়ই নিজের প্রতি অবিচার করে থাকে।(সূরা বাক্বারা ঃ ২৩১)

الردة
ধর্মচ্যুতি

রিদ্ধা- শব্দের আভিধানিক অর্থ হল প্রত্যাবর্তন।
যেমন আল্লাহ্ সোবহানাহু ওয়া তা'লা বলেন ঃ

ولا ترتدوا على أدباركم

অর্থ- তোমরা পিছনে ফিরে যেও না। (সূরা আল্-মায়েদাহ্ ঃ ২১)
রিদ্ধার পারিভাষিক অর্থ হল ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাওয়া।
যেমন আল্লাহ্ সোবহানাহূ ওয়া তা'লা বলেন ঃ

وَمَن يرتَدد منكُم عَن دِينِه فَيَمُت وَهُوَ كافِرُ فَأُولئكَ حَبِطَت أعمالَهُم فَيَمُت وَهُوَ كَافِرُ فَأُو لَئِكَ حَبِطَت أَعمَلَهُم فِي الدنيَا وَالأَخِرَة وَ أُول ~كَ أَصحَاب النارِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ

অর্থ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কাফের অবস্থায় ধর্মত্যাগী হয়ে মৃত্যু বরণ করবে তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। এই লোকগুলি জাহান্নামবাসী, তারা উহাতে চিরস্থায়ী থাকবে। (সূরা বাক্বারা ঃ ২১৭)

ধর্মচ্যুতি বা (রিদ্ধা)র প্রকার ঃ
ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় সমূহের মধ্যে যে কোন বিষয়ে পতিত হলেই মানুষ ধর্মচ্যুত বা মুরতাদ হয়ে যায়। ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় অনেক, যা চার ভাগে বিভক্ত।

১। বচন বা কথার মাধ্যমে ধর্মচ্যুতি ঃ যেমন- আল্লাহ্ তা'লা বা তাঁর রাসূলদেরকে গালি দেয়া অথবা আল্লাহ্র ফেরেশতাদের গালি দেয় বা কোন একজন রাসূলকে গালি দেয়া। এঁদের বিষয়ে অশ্লীল কথা বলা, অথবা অদৃশ্য বিষয়ে (গায়বি এলেম) জানার দাবী করা বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর অন্য কেউ নবুয়্যত লাভের দবী করা অথবা কেউ এরূপ দাবি করলে তাকে নবী বলে স্বীকার করা। অথবা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নিকট বিপদ হতে মুক্তি কামনা করা বা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা (যে বিষয়ে ক্ষমতা কেবল আল্লাহ্র হাতে রয়েছে)। অনুরূপ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নিকট প্রার্থনা করা (যে বিষয়ে ক্ষমতা কেবল আল্লাহ্ তা'লার হাতে রয়েছে)।

২। কর্মের মাধ্যমে ধর্মচ্যুতি ঃ যেমন মূর্তি, পাথর, বৃক্ষ, কবর ইত্যাদিকে সিজদা করা বা এসবের উদ্দেশ্যে জবেহ্ করা, কুরআনকে অবমাননা করা,যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা বা যাদু শিক্ষা প্রদান করা অথবা আল্লাহ্র বিধান বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রদান এ বিশ্বাসে যে, আল্লাহ্র বিধান বিরুধী সিদ্ধান্ত বৈধ।

৩। বিশ্বাসের মাধ্যমে ধর্মচ্যুতি ঃ আল্লাহ্ তা'লার কোন অংশীদার আছে বলে বিশ্বাস করা বা ব্যভিচার, মধ্যপান ইত্যাদি প্রকাশ্য হারামকে হালাল মনে করা, বা প্রকাশ্য হালালকে হারাম বলে বিশ্বাস করা। যেমন, সালাত আদায় করা, বা চাল,রুটি, ডাল-ভাত বৈধ খাবার ইত্যাদিকে হারাম বলে বিশ্বাস করা। অথবা বৈধ ভেবে আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিষয়ের পরিপন্থী আদেশ প্রদান করা। অনুরূপভাবে সুস্পষ্ট যেকোন হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল বিশ্বাস করা। যে বিষয়ে উম্মতের ইজমা রয়েছে,যে বিষয় অজানা থাকার নয়।

৪। পূর্ব্বোল্লিখত বিষয়ে সন্দেহের মাধ্যমে ধর্মচ্যুতি ঃ যেমন জিনা-ব্যভিচার শরিয়তে অবৈধ। অনুরূপ শুকরের গোস্ত খাওয়া অবৈধ। এসব অবৈধ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করা যেহেতু এসব স্পষ্ট অবৈধ বিষয়। অথবা রাসুল সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিধানকে বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যবাদিতাকে অস্বীকার করা। অথবা অন্য কোন নবী-রাসুলের ধর্মকে সন্দেহ করা অথবা ইসলাম ধর্ম বর্তমান যুগোপযোগী নয় মনে করা।

ধর্মচ্যুত ব্যক্তির ধর্মচ্যুতি প্রমান হওয়ার পর সে বিষয় সম্পর্কিত বিধান।

১। ধর্মচ্যুত ব্যক্তিকে তিন দিনের মধ্যে তওবার জন্য বলা হবে। এর মধ্যে যদি তওবা করে ফিরে আসে তবে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে।

২। তিন দিনের মধ্যে যদি ফিরে না আসে এবং ফিরে আসাকে অস্বীকার করে তবে এরূপ ব্যক্তিকে হত্যা করা ওয়াজিব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

من بدل دينه فا قتله

অর্থ- যে (ইসলাম) ধর্ম পরিবর্তন করল, তাকে হত্যা কর। (বুখারী)

৩। যখন কাউকে মুরতাদ হওয়ার কারণে হত্যা করা হবে বা কেউ মুরতাদ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে তখন তার মাল-সম্পদ মুসলমানদের বায়তুল মালে পরিণত হবে।

৪। মুরতাদের মুসলিম স্ত্রীকে তার থেকে পৃথক করা হবে। কেন না ধর্মচ্যুত ব্যক্তির জন্য সে স্ত্রী বৈধ নহে।

৫। ধর্মচ্যুত (মুরতাদ) ব্যক্তি ও তার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্র বিচ্ছিন্ন হবে। তাদের কেউ একে অপরের সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে না।

৬। যখন কেউ মুরতাদ হিসাবে মারা যাবে অথবা হত্যা করা হবে তখন তাকে গোসল দেয়া হবে না,তার উপর জানাজার সালাত পড়া হবে না এবং তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হবে না। বরং তাকে কাফেরদের কবরস্থানে বা মাঠে-ঘাটে কোথাও পুঁতে রাখা হবে।

<u>প্রশ্ন পত্র</u>

১। ফাসেকির আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখ।
২। ফিসকের প্রকার সমূহ দলীল ও উদাহরণসহ উল্লেখ কর।
৩। ছোট জুলুম ও বড় জুলুমের মধ্যে পার্থক্য কি?
৪। রিদ্ধার আভিধানিক ও পারিভাষিক পার্থক্য লিখ।
৫। রিদ্ধার প্রকারগুলি কি কি? প্রত্যেক প্রকারের একটি উদাহরণসহ লিখ।
৬। কেউ ধর্মচ্যুত হয়ে মারা গেছে এর প্রমাণ হলে তার সম্পর্কে বিধানগুলি হতে যে কোন তিনটির উল্লেখ কর।

التكفير

কাফের সাব্যস্ত করার বিধান

কাফের সাব্যস্ত করার বিধানের সংজ্ঞা ঃ তা হল কোন কথা , কর্ম, বা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে এ সিদ্ধান্ত দেয়া যে, তা কুফরী (ব্যাপকভাবে)। অথবা কোন ব্যক্তির কথা, কর্ম বা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত দেয়া যে, উক্ত ব্যক্তি কাফের (নির্দিষ্ট ভাবে)।

কোন কোন অবস্থায় উক্ত বিষয়ে মানুষের প্রতি সিদ্ধান্ত প্রদান করা যায়!
মানুষ কখনো মূলতঃই কাফের থাকে। যেমন ইহূদী, নাছারা বা অগ্নি উপাসকরা। তাদেরকে কাফের জানা বা তাদের কুফরীকে সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। বরং যে কেহ তাদের কাফের মনে না করে বা তাদের কাফের হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ করে তা হলে সেও কাফের।

আর কখনও মানুষ মূলতঃ মুসলমান থাকে, এমতাবস্থায় কাউকে কাফের সাব্যস্ত করা ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ নয় যতক্ষণ না তার মধ্যে কাফের সাব্যস্ত করার যাবতীয় শর্ত পাওয়া যাবে এবং কাফের না হওয়ার কারণ সমূহ অবিদ্যমান থাকবে। অতঃপর কিতাব ও সুন্নাহ্র মাধ্যমে যে সকল কর্ম প্রমানিত হবে যে, তা কুফরী; তবে তাকে কুফরী বলা ওয়াজিব। কিন্তু কেহ কিতাব ও সুন্নাহ্র পরিপন্থী কাজ করলেই অথবা উপরোল্লিখিত কোন বিষয়ে কর্মে পতিত হলেই কাফের হয়ে যাবে না। কারণ হতে পারে এ বিষয়ে তার কোন উজর রয়েছে যা শরিয়তে গ্রহণ যোগ্য-যেমন অজ্ঞতা অথবা ভ্রান্তিবশতঃ ইত্যাদি (যা কাফের সাব্যস্ত করার শর্ত সমূহ ও কাফির না হওয়ার কারণ সমূহ অধ্যায়ে জানা যাবে।)

কোন মুসলমানকে কাফের সাব্যস্ত করার ভয়াবহতা ঃ
কোন মুসলমানকে কাফের সাব্যস্ত করা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কাউকে কাফের সাব্যস্ত করার পূর্ণ শর্ত সমূহ পাওয়া না যাবে এবং এ বিষয়ে বাধা দানকারী বিষয় দূর না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে কাফের বলা বৈধ নয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন ঃ

يآأيها الذين ءامنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحيوة الدنيا (سورة النساء– ٩٤)

'হে মুমিনগন! তোমরা যখন আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য বের হবে তখন ভালভাবে অনুসন্ধান করে নিবে এবং তোমাদিগকে সালাম করলে একথা বলবেনা যে, তুমি মুসলিম নও। দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে'। (সূরা নিসা ঃ ৯৪)
রাসুল সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما (متفق عليه)

যদি কোন মানুষ তার (মুসলিম) ভাইকে বলে '' হে কাফের'' তা হলে কথাটি দু'জনার একজনের দিকে ফিরে আসবে। (মুত্তাফাক আলাইহে)
আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব কারণে বা যাদের কুফরীর ঘোষণা দিয়েছেন, সে সব কারণ ব্যতীত বা তাদের ছাড়া অন্যকে কাফের সাব্যস্ত করা বৈধ নয়।

ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রঃ) বলেন, আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আত তাদের বিরুদ্ধবাদীদের কাফের বলেন না, যদিও বিরুদ্ধবাদীগণ তাঁদের কাফের হিসাবে অভিহিত করে থাকে। কেননা কুফরী সাব্যস্ত করা শারয়ী বিধানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এখানে অতি সতর্কতা বাঞ্চনীয়। বিপক্ষকে প্রতিশোধমূলক অনুরূপ শাস্তি দেয়া কারোর জন্য উচিৎ নয়। যেমন কেহ আপনার উপর মিথ্যারূপ করলে আপনিও তার উপর অযথা মিথ্যাচার করবেন। অথবা কেউ আপনার পরিবারের সাথে অবিচার বা ব্যভিচার করলে আপনিও তার পরিবারের সদস্যদের সাথে অনুরূপ আচরণ করবেন ইত্যাদি।

شروط التكفير

কাফের সাব্যস্ত করার শর্ত সমূহ

১। দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়া যে,বিষয়টি কুফরী এবং তাতে লিপ্ত ব্যক্তি কাফের।
২। এমন ব্যক্তির উপর বিধানটি কার্যকর হবে, যে তা জেনেও ইচ্ছাকৃত ভাবে তাতে লিপ্ত হয়। কিন্তু যদি কেউ অজ্ঞতা বশতঃ বা ভুলক্রমে লিপ্ত হয় অথবা কাউকে এমন বিষয়ে জোর করে বাধ্য করা হয়, বা উক্ত বিষয়ে পতিত ব্যক্তির নিকট কোন ভিন্ন ব্যাখ্যা থাকে, তবে এসকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিধানটি প্রযোজ্য হবে না।
৩। কাউকে কাফের সাব্যস্ত করার পূর্বে কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তির নিকট এবিষয়ে সঠিক প্রমাণ পেশ করা। এর পরও যদি কুফরীর উপর অটল থাকে তা হলে উক্ত ব্যক্তিকে কাফের সাব্যস্ত করা হবে এবং তাকে কুফরী ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হবে।

এক্ষেত্রে কোন মুসলমানের নিকট সঠিক প্রমাণ পেশ করার অর্থ হল, রাসুল সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এবিষয়ে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা উক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করা এবং তার কোন সংশয় থাকলে তা নিরসন করা। বিশেষ করে এমন ব্যক্তির জন্য এটা জরূরী, যে নব মুসলিম অথবা যে ইসলামী সভ্যতা হতে বহু দূরে বসবাস করেন বা এমন দেশে বাস করেন যেখানে ইসলামী সংস্কৃতি-সভ্যতা বিলীনপ্রায়।
সঠিক প্রমাণ পেশ করা ছাড়া কোন মুসলিমকে কাফের সাব্যস্ত করা বৈধ নয়। তার দলীল হলোঃ আল্লাহ্ বলেন ঃ **وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا**
'আমি রাসূল না পাঠান পর্যন্ত কাউকেও শাস্তি দেই না' (সূরা বানী-ঈস্রাইল ঃ ১৫)

কাফের সাব্যস্ত করার বাধা সমূহ ঃ

১। অজ্ঞতা ঃ

স্থান, কাল, পাত্রভেদে অজ্ঞতাকে কাফের সাব্যস্ত করার বাধা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যেমন অজ্ঞ ব্যক্তির আবাসিক এলাকায় ইসলামী শিক্ষার প্রসার আছে কি নেই! বা যে বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে কুফরীতে লিপ্ত, তা কি সাধারণ মানুষের নিকট গোপন থাকার বিষয়, না কি তাদের নিকট প্রকাশ থাকার মত বিষয় ইত্যাদি। এব্যাপারে দলীল হল ঃ
রাসুল সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী। তিনি বলেন ঃ সীমালংঘনকারী জনৈক ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় তার সন্তানদের ডেকে বলল; 'মৃত্যুর পর তোমরা আমায় জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে আমার ছাইগুলো বাতাসে উড়িয়ে দিবে। কারণ আল্লাহ্ যদি আমায় ধরতে পারেন তাহলে এমন কঠিন শাস্তি দিবেন, যা আর কাউকে দেননি'।
তার মৃত্যুর পর তাই করা হল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা জমীনকে নির্দেশ দিলেন, ঐ ব্যক্তির সকল অংশ বিশেষকে একত্রিত কর। তাই করা হল। ঐ ব্যক্তি দন্ডায়মান হলে আল্লাহ্ তা'লা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তুমি এমন করলে? জবাবে লোকটি বলল; 'প্রভূ হে আপনার ভয়ে'। অতঃপর লোকটিকে ক্ষমা করে দেয়া হল। (মুত্তাফাক আলাইহি)
উক্ত ব্যক্তি আল্লাহ্র ক্ষমতা ও মৃত্যুর পর পূনর্জ্জীবনকে অস্বীকার করেছিল। আর উভয়টিকে অস্বীকার করাই কুফরী। কিন্তু তার হৃদয়ে আল্লাহ্র ভয় ও তাঁর প্রতি ঈমান বিদ্যমান থাকা সত্বেও তার অজ্ঞতা বশতঃ এবিষয়ে ভুল ধারণা করেছিল। তাই আল্লাহ্ পাক তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

২। ভুল করাঃ

তা হল কিছু করতে ইচ্ছা করে হঠাৎ অনিচ্ছাকৃত ভাবে অন্য কিছু করে ফেলা। যেমন কেউ কাফেরকে হত্যা করার ইচ্ছে করে ভুল বশতঃ কোন মুসলিম কে হত্যা করে ফেলল বা কেউ আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদানের ইচ্ছা করেও ভুলবশতঃ আল্লাহ্র বিধান বিরোধী সিদ্ধান্ত দিল- এবিষয়ে দলীল হল আল্লাহ্র বাণী ঃ
رَبَنا لا تُؤَاخِذنَآ إن نسِينَآ أوأخطَأنَا (سورة البقرة-٢٨٦)
'প্রভূ হে! আমাদের ভুল-ত্রুটি ধৃত করবেন না'। (সূরা বাকারা ঃ ২৮৬)
রাসুল সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ

إن الله وضع عن أمتى الخطاء والنسيان وما استكر هوا عليه

'আল্লাহ্ নিশ্চয়ই আমার উম্মতের ভুল-ত্রুটি ও জোর পুর্বক বাধ্য করাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন'।

(ইবনু মাযাহ্, দারাকুতনী)

৩। বাধ্য করন ঃ

অপরের দ্বারা বাধ্য হয়ে ভয়-ভীতির কারণে অনিচ্ছা সত্বেও নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হওয়া। যেমন কাউকে যদি মার-পিট করে বা শাস্তি দিয়ে অথবা মৃত্যুর হুমকি দিয়ে কুফরীতে লিপ্ত হতে বাধ্য করা হয় অথবা ইসলামকে গালি দিতে বাধ্য করা হয়, অতঃপর উক্ত ব্যক্তি হৃদয়ে ঈমানের প্রতি দৃঢ় থেকে বাহ্যিকভাবে কুফরীতে লিপ্ত হয় তবে এ কারণে তাকে কাফের সাব্যস্ত করা হবে না। কারণ এক্ষেত্রে তার অপারগতার অজুহাত গ্রহণযোগ্য।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَن كَفَرَ بِاللهِ من بَعدِ إِيمَنِه إلا مَن أُكرِهَ وَ قَلبُهُ مُطمَئِنٌّ بِالإِيمَنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالكُفرِ صَدرًا فعليهم غَضَبُ مِنَ اللهِ وَ لَهُم عَذَابُ عَظِيمُ (النحل–١٠٦)

'কেউ ঈমান আনার পরে আল্লাহ্কে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহ্র গযব এবং তার জন্য আছে মহা শাস্তি; তবে তার জন্য নয় যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয়েছে, কিন্ত তার চিত্ত ঈমানে অবিচল'। (সূরা নাহল ঃ ১০৬)

বাধ্য হয়ে কুফরীতে লিপ্ত হওয়ায় ক্ষেত্রে অপারগতার অজুহাত গ্রহন করার জন্য ৪টি শর্ত রয়েছে।

(ক) যে ব্যক্তি বাধ্য করাচ্ছে সে তার হুমকি–ধমকি বাস্তবায়নে সক্ষম এবং যাকে বাধ্য করা হচ্ছে সে নিজেকে রক্ষা করতে অপারগ।

(খ) বাধ্যকৃত ব্যক্তির মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হওয়া যে, আদিষ্ট বিষয়ে উপনিত না হলে, এ বিষয়ে কৃত হুমকি বাস্তবায়ণ অনিবার্য।

(গ) হুমকিটি যেন তাৎক্ষণিক বা নিকটবর্তী হয়।

(ঘ) বাধ্যকৃত ব্যক্তি হতে যেন এ কথা প্রকাশ না পায় যে, উক্ত কর্মে সে তুষ্ট বা কাজটি ইচ্ছাকৃত ভাবে করেছে।

জোখা উচিত যে

বাধ্যকৃত অবস্থায় কুফরীর কথা বলা বা কাজ করা যদিও যায়েজ কিন্তু এ অবস্থাতেও কুফরীতে লিপ্ত না হয়ে শাস্তি ভোগ করা বা জীবন বিসর্জনের মাধ্যমে ধৈর্য ধারণ করা উত্তম ও মর্যদাপূর্ণ। বিশেষ করে সাধারণতঃ মানুষ যাদের অনুসরণ করে থাকে এবং যাদের কথাও কর্ম অনুযায়ী চলে, তাদের এক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ বাঞ্চনীয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের পুর্বে যারা (সঠিক আদর্শের উপর) ছিল, তাদের মধ্য হতে কাউকে (বিরোধীগন) ধরে নিয়ে মাটিতে অর্ধেক পূঁতে রেখে করাত দিয়ে দ্বি-খন্ডিত করে ফেলত এবং লোহার চিরুনি দিয়ে তাদের দেহের হাড় মাংস পৃথক করে ফেলত। তথাপিও এসব নির্যাতন তাদের দ্বীন হতে সরাতে পারেনি। (বুখারী)

(৪) তা'বীল (ব্যাখ্যা) তা হল পৃথক দলীললের ভিত্তিতে শব্দের বাহ্যিক অর্থের বিপরীত অর্থ গ্রহণ করা। উহা দু প্রকার ঃ

(ক) যে ব্যক্তি সংশয়-সন্দেহের বশঃবর্তী হয়ে তা'বীল করবে, তার তা'বীলের ওযর গ্রহণ যোগ্য হবে। যেমন, কারো উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু আরবী ভাষায় আভিধানিক অর্থের ভিন্নতার কারণে সংশয়ে পড়ে কোন একটি অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে তা'বীল (ব্যাখ্যা) করেছে, এমন ব্যক্তির তা'বীলের ওযর গ্রহণযোগ্য। তাকে উক্ত তা'বীলের জন্য কাফের সাব্যস্ত করা হবে না।

(খ) যাদের তা'বীলের ওযর গ্রহণযোগ্য নয়, যেমন- দার্শনিক, বাতেনী প্রভৃতিদের তা'বীল। কারণ তাদের আসল উদ্দেশ্যই হল ধর্মকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা,চাই তা পূর্ণ ধর্মকেই মিথ্যা বলে বা তার অপব্যাখ্যা করে। অথবা ধর্মের মৌলিক বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। যেমন আইন-কানূন, উত্তরাধিকার বিধান ইত্যাদিকে অপব্যাখ্যা করা। এমন তা'বীল করা কুফরী এবং তা'বীলকারীগণ ধর্মচ্যুত হবে।

(৫) তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) তা হল যার কথা প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়, তার কথায় অন্ধ অনুসরণ করা। এলেম ও গভেষণার যোগ্যতা থাকা সত্বেও তা'বীলের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে কুফরীতে লিপ্ত হলেও যেহেতু কোন ব্যক্তির ওযর গ্রহণযোগ্য, তাই এরূপ ব্যক্তির অন্ধঅনুসারী অজ্ঞ সাধরণ মানুষদের ওযর গ্রহণ করা স্বাভাবিক।

অতঃপর, অজ্ঞতা বশতঃ কেহ যদি কারও অন্ধ অনুসরণের মাধ্যমে কুফরীতে লিপ্ত হয়, তা হলে তার ওযর গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি কেহ শরয়ী প্রমাণ গ্রহণে সক্ষমতা সত্যেও এবিষয়ে ত্রুটি করে, তা হলে সে গোনাহ্গার হবে। এমতাবস্তায় তাকে কাফির সাব্যস্ত করা হবে না। কিন্তু যদি এমন ব্যক্তির নিকট সঠিক প্রমান পেশ করা হয়, তা সত্বেও গ্রহন না করে বরং কারো অন্ধ অনুসরণের প্রতি অটল থাকে তবে উক্ত ব্যক্তি কুফরীতে লিপ্ত হিসাবে বিবেচিত হবে।

প্রশ্ন

১। ব্যাপক ভাবে ও ব্যক্তি বিশেষকে কাফের সাব্যস্ত করার নিয়ম কি?

২। কোন কোন অবস্থায় মানুষদের কুফরীতে লিপ্ত বলে সাব্যস্ত করা যায়। কোন মুসলিমকে কাফের সাব্যস্ত করার ভয়বহতা কি?

৩। কাউকে কাফের সাব্যস্ত করার তিনটি শর্ত উল্লেখ কর।

৪। কাফের সাব্যস্ত করার বাধা সমূহ কয়টি। তার যে কোন একটি বিষয়ে ব্যাখ্যা দাও।

৫। বাধ্য হয়ে কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অপারগতার অজুহাত গ্রহণ করার জন্য চারটি শর্ত আছে। সেগুলো কি কি?

৬। তাক্লীদ কি? তাক্লীদ বশতঃ কুফরীতে লিপ্ত হলে তার ওযর গ্রহণীয় হবে কি?

الفـــتـــن

ফিৎনা

ফিৎনার অর্থঃ

ফিৎনা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়:

১) **বিপদ-মুছীবতের মাধ্যমে পরীক্ষা করা।** যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ "মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি, একথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে?" (সূরা আনকাবূত- ২)

২) **শাস্তি।** আল্লাহ্ বলেন: لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا "যারা নির্যাতিত হবার পর হিজরত করে...।" (সূরা নাহাল-১১০) আল্লাহ্ আরো বলেন: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ "সেদিন যখন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে অগ্নিতে।" (সূরা যারিয়াত-১৩)

৩) **শির্ক ও কুফরী।** আল্লাহ্ বলেন: حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ "যে পর্যন্ত ফিৎনা বা শির্ক দূরীভূত না হয়।" (সূরা বাক্বারা- ১৯৩)

৪) **নিফাক (মুনাফেকী)।** আল্লাহ্ বলেন: وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ "কিন্তু তোমরা (মুনাফেকীর মাধ্যমে) নিজেদেরকে বিপদগ্রস্থ করেছো।" (সূরা হাদীদ- ১৪)

৫) **বিভ্রান্ত করা।** আল্লাহ্ বলেন: وَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ فِتْنَتَهُ "আর আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করার ইচ্ছা করেন।" (সূরা মায়েদাহ্- ৪১)

৬) **হত্যা ও বন্দী।** আল্লাহ্ বলেন: إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا "যদি তোমরা ভয় কর যে, কাফেরগণ তোমাদেরকে হত্যা বা বন্দী করবে।" (সূরা নিসা- ১০১)

৭) **মতানৈক্যঃ** আল্লাহ্ বলেন: وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ "আর তারা তোমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে দৌড়াদৌড়ি করে ফিরতো।" (সূরা তওবা- ৪৭)

৮) **পাগলামিঃ** আল্লাহ্ বলেন: بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ "তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্থ।" (সূরা কলম- ৬)

৯) **আগুন দিয়ে জালিয়ে দেয়াঃ** আল্লাহ্ বলেন: إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا "নিশ্চয় যারা মু'মিন নর-নারীকে (আগুনে জ্বালিয়ে) বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তওবা করে নি।" (সূরা বুরূজ- ১০)

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে বিভিন্ন ফিৎনার মধ্যে নিমজ্জিত করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন: তিনি এরশাদ করেন: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ "আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা আম্বিয়া- ৩৫) রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন: "চাটাইয়ের কাঠিগুলো যেমন একটি একটি করে সাজানো হয়, তেমনি অন্তরের মধ্যে একটি একটি একটি করে ফেৎনা পতিত হয়। যে অন্তর উহা গ্রহণ করবে তার মধ্যে একটি কাল দাগ পড়ে যাবে। আর যে অন্তর তাকে প্রত্যাখ্যান করবে তার মধ্যে একটি শুভ্র দাগ পড়বে। এভাবে অন্তরগুলো দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি সাদা পাথরের মত শুভ্র। তাকে কোন ফিৎনাই ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে না। আর একটি অন্তর ছাইয়ের মত কাল যেমন কোন পানির পাত্রকে উপুড় করে রাখা হয় (সে পাত্র যেমন পানি ধরে রাখে না, তেমনি উক্ত অন্তর) কোন ভাল কাজ চেনে না কোন অন্যায়কে অন্যায় মনে করে না। শুধু সে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে।" (ছহীহ্ মুসলিম) এধরণের ফিৎনা কোন জাতির জন্য শাস্তি স্বরূপ এসে থাকে আবার কারো জন্য রহমত ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এসে থাকে।

ফিৎনার প্রকারভেদঃ

আল্লাহ্ যে সমস্ত ফিৎনার মাধ্যমে বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন তা অনেক ধরণের। আর তা দু'টি প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধঃ

ক) খাহেশাত ও প্রবৃত্তির ফিৎনা। যেমন সম্পদ ও নারীর ফিৎনা।

খ) সংশয়-সন্দেহের ফিৎনা। যেমন ঐ সমস্ত প্রবৃত্তি যার ফলে বিভিন্ন বিদআ'তের উৎপত্তি হয়েছে, মুসলামনদের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তারা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়েছে।

ইসলামে ব্যাপক ফিৎনা এবং বিশেষ ফিৎনা সম্পর্কে অনেক আলোচনা এসেছে। যার উদ্দেশ্য হল সব ধরণের ফিৎনা থেকে মানুষকে সতর্ক করা। তাছাড়া এমন কিছু ফিৎনার কথাও আলোচনা হয়েছে যা শেষ যুগে প্রকাশ লাভ করবে। যেমন 'দুহাইমা' নামক ফিৎনা, 'আহ্লাস' নামক ফিৎনা, দাজ্জালের ফিৎনা, সমস্ত মানুষ দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ফিৎনা, শেষ যুগে কুফরী ও শির্কের ব্যাপক ফিৎনা, মুসলামনদের মাঝে পারস্পারিক কোন্দল ও যুদ্ধের ফিৎনা ইত্যাদি।

ফিৎনার কারণ সমূহঃ

ফিৎনার অনেক কারণ আছে। যেমনঃ

১) **প্রবৃত্তির অনুসরণ ও অসৎ উদ্দেশ্য।** আল্লাহ্ বলেনঃ يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعْ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ "হে দাঊদ (আ:) আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি মানুষের মাঝে সুবিচার কর এবং খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না, কেননা এটা তোমাকে আল্লাহ্র পথ হতে বিচ্যুত করবে।" (সূরা ছোয়াদ- ২৬) সুতরাং প্রবৃত্তি মানুষকে অন্ধ ও বধির করে দেয়। তার সামনে সত্যকে বাতিল হিসেবে উপস্থাপন করে আর বাতিলকে সত্যরূপে দেখিয়ে থাকে।

২) **বাড়াবাড়ি।** দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি হল ফিৎনায় পতিত হওয়ার অন্যতম বড় একটি কারণ। কেননা খারেজীগণ শুধু মাত্র বাড়াবাড়ির কারণেই বিদআতে লিপ্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন: "তোমরা অতিরঞ্জন থেকে সাবধান! কেননা অতিরঞ্জন তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে। বাড়াবাড়ি করতে যেয়ে তারা পরস্পরের রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং হারাম বিষয় সমূহকে হালাল করে নিয়েছে।" (ইবনু মাজাহ্ ও হাকেম)

এমনিভাবে বাড়াবাড়ির বিপরীতে দ্বীনের বিষয়ে শিথিলতা দেখাতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে মুর্জিয়া মতবাদ।

৩) **অস্পষ্ট বিষয়ের অনুসরণ এবং সুস্পষ্ট বিষয় পরিত্যাগ।** আল্লাহ্ বলেনঃ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا "অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, ফলত: তারাই ফিৎনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে অস্পষ্টের অনুসরণ করে। অথচ আল্লাহ্ ব্যতীত ওর অর্থ কেউই অবগত নয়; আর যারা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত, তারা বলে: আমরা ওতে বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সমাগত।" (সূরা আল ইমরাম- ৭)

৪) **অজ্ঞতা।** শরীয়ত তথা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যা নিয়ে এসেছেন সে সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (র:) বলেন: 'বিভিন্ন স্থান এবং বিভিন্ন যুগে রিসালাতের বাণী গোপন থেকে। যে কারণে মানুষ রাসূলের আনিত বিষয় থেকে অজ্ঞ থাকে। কখনো আসল শব্দই (মূল কথা) অজ্ঞতায় থেকে যায়, কখনো শব্দটি জানলেও তার প্রকৃত অর্থ বুঝে না। আর তখনই তারা নবুওতের আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে জাহেলিয়াতে পতিত হয়েছে। এ থেকেই মানুষ লিপ্ত হয়েছে শির্কে, বিভক্ত করে নিয়েছে দ্বীনকে বিভিন্ন দল ও উপদলে। তাই কথা ও কাজের মাধ্যমে সংঘটিত ফিৎনা সমূহ অজ্ঞতারই অন্তর্ভূক্ত। আর তার কারণ হল নবুওতের আলো গোপন থাকা, রেসালাতের হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হওয়া।'

ফিৎনার সময় মুসলিম ব্যক্তির করণীয়:

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সব ধরণের ফিৎনা থেকে উম্মতকে সতর্ক করেছেন, আর পথ দেখিয়েছেন ফিৎনার সময় সে কিভাবে তা থেকে মুক্তি লাভ করবে। বর্ণনা করেছেন সে সময় মুসলিম ব্যক্তি করণীয় কি। তম্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ:

১) **ফিৎনা থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।** আর তা প্রত্যেক ছালাতের মধ্যে। আবূ হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন: "যখন তোমরা শেষ বৈঠকের তাশাহ্হুদ পাঠ করবে তখন আল্লাহ্‌র কাছে চারটি বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে: ক) জাহান্নামের আযাব থেকে খ) ক্বরের আযাব থেকে গ) জীবন-মৃত্যুর ফিৎনা থেকে এবং ঘ) মাসীহ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে। (ছহীহ মুসলিম)

২) **কুরআন এবং সুন্নাহ্‌কে আঁকড়ে ধরা।** কেননা এদু'টিকে আঁকড়ে ধরে থাকলে বান্দা আক্বীদা ও আমলের বিভ্রান্তি ও বক্রতা থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। কোন ফিৎনায় পতিত হবে না। যে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহ্ আঁকড়ে থাকবে এবং নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর হেদায়াতের উপর জীবন পরিচালনা করবে, দা'ওয়াতী কাজ করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে- সে যাবতীয় ফিৎনা থেকে পরিত্রাণ পাবে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর হেদায়াতের বিরোধিতা করা বা তা থেকে বিচ্যুত হওয়াই তো হল আসল ফিৎনা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى "পরে আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ আসলে যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখ-কষ্ট পাবে না।" (সূরা ত্বহা- ১২৩) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন: "আমি তোমাদেরকে ওছিয়ত করছি আল্লাহ্ ভীতির, নেতার কথা শ্রবণ ও আনুগত্য করার, যদিও সে হাবশী ক্রীতদাস হয়। কেননা তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দীর্ঘ জীবন লাভ করবে সে অচিরেই অনেক ধরণের মতানৈক্য দেখতে পাবে। তোমরা নব উদ্ভাবিত বিষয় (বিদআত) থেকে সাবধান! কেননা উহা পথভ্রষ্টতা। তোমাদের মধ্যে যারা উক্ত (মতানৈক্যের) যুগ পাবে, তাদের উপর আবশ্যক হল, তারা আমার সুন্নাত এবং সুপথ প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে। উহা দাঁত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরবে (অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে)। (তিরমিযী)

৩) **যখন ফিৎনা দেখা দেবে তখন মুসলমানদের জামাআত এবং তাদের ইমাম (নেতা)কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা।** যদি মুসলমানদের জামাআত না থাকে এবং তাদের ইমামও না থাকে, তবে সে সময় সমস্ত দল (পথভ্রষ্ট ফেরকা সমূহ) থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া। হুযায়ফা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষ রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো, আর আমি তাঁকে অকল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম, এই ভয়ে যে আমি হয়তো তাতে পতিত হয়ে যাব। তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা পূর্বে (কুফরীর) অজ্ঞতা ও অমঙ্গলের মধ্যে ছিলাম। অত:পর আল্লাহ্ আমাদেরকে (হেদায়াতের) এই কল্যাণ দান করলেন। এই কল্যাণের পর কি কোন অকল্যাণ সংঘটিত হবে? তিনি বললেন: হ্যাঁ হবে। আমি বললাম, উক্ত অকল্যাণের পর কি কোন কল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে। তবে তা ধুঁয়ামুক্ত (নির্ভেজাল) হবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে ধুঁয়া কিরূপ? তিনি বললেন, একদল লোক এমন হবে, যারা আমার হেদায়াতের পথ ছেড়ে অন্য পথ গ্রহণ করবে। তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ উভয়ই তুমি প্রত্যক্ষ করবে। আমি প্রশ্ন করলাম, উক্ত কল্যাণের পর কি আর কোন অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আসবে। এদকল লোক এমন হবে যারা জাহান্নামের দারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে মানুষকে আহবান করবে (অর্থাৎ- জাহান্নাম আবশ্যক করে এমন বিষয়ের প্রতি দা'ওয়াত দিবে)। যেই তাদের ডাকে সাড়া দিবে তাকেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদেরকে তাদের পরিচয় জানিয়ে দিন! তিনি বললেন, তারা এমন লোক যারা আমাদেরই অন্তর্ভূক্ত হবে এবং আমাদের ভাষাতেই কথা বলবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এধরণের অকল্যাণের যুগে যদি আমি পৌঁছে যাই, সে অবস্থায় আমার কারণীয় সম্পর্কে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, মুসলমানদের জামাআত এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। আমি প্রশ্ন করলাম, যদি তাদের কোন জামাআত না থাকে এবং ইমামও না থাকে? তিনি বললেন, তখন ঐসমস্ত (পথভ্রষ্ট)

দলের সবগুলোকে পরিত্যাগ করবে। যদিও গাছের একটি শিকড়কে কামড়ে ধরে থাকতে হয় (অর্থাৎ উক্ত সময়ের দু:খ-কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করবে)। আর মৃত্যু আসা পর্যন্ত তুমি ঐ অবস্থাতেই থাকবে।" (বুখারী হাদীছ নং ৬৫৯১ও মুসলিম)

৪) **মুসলিম শাসকদের অত্যাচারের উপর ধৈর্য ধারণ করা।** তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা। কিন্তু যদি তাদের থেকে প্রকাশ্য কুফরী পাওয়া যায় তবে সে কথা ভিন্ন। (অর্থাৎ শর্ত সাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে।)

عن عبادة بن الصامت (رضي الله عنه) قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لاننازع الأمر أهله إلا أن تروا كُفراً بَواحاً عندكم من الله فيه برهان.) –رواه البخاري

ও'বাদা বিন ছামেত (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে ইসলামের পথে আহবান করলেন, আমরাও তাঁর কাছে বায়আ'ত করলাম। তিনি বলেন, আমাদের কাছে যে সমস্ত বিষয়ের উপর তিনি বায়আ'ত নিলেন তা হল, আমরা যেন সুখের ও দুঃখের অবস্থায়, সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় এবং আমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দেয়ার (স্বার্থহানীর) ক্ষেত্রেও যেন (নেতার) কথা শুনি ও তার আনুগত্য করি। ক্ষমতাসীন (শাসক) ব্যক্তির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবো না যতক্ষন না তার থেকে সুস্পষ্ট কুফরী দেখতে পাও যে ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (কুরআন-সুন্নাহ্‌তে) তোমাদের জন্য স্বচ্ছ দলীল রয়েছে।" (বুখারী হাদীছ নং ৬৫৬৫) আর ব্যাপকভাবে সর্বক্ষেত্রে ধৈর্য অবলম্বন করবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

"এবং নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা এবং ধন ও প্রাণ এবং ফল-ফসলের অভাবের দ্বারা; এবং ঐসব ধৈর্যশীলকে সুসংবাদ প্রদান কর। যাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হলে তারা বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই জন্যে এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।" (সূরা বাক্বারা- ১৫৫-১৫৬)

৫) **ফিৎনায় জড়িয়ে পড়া থেকে যে কোনভাবে দূরে থাকার চেষ্টা করা।** কেননা মানুষ ফিৎনা থেকে যত দূরে থাকবে ততই সে ফিৎনায় পতিত ব্যক্তির চেয়ে অধিক নিরাপদে থাকবে। আবূ বাকরা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয় অচিরেই অনেক ধরণের পাপাচারের ফিৎনা দেখা দেবে। সে সময় ফিৎনা থেকে বসে থাকা ব্যক্তি সে ক্ষেত্রে দাঁড়ানো ব্যক্তি অপেক্ষা নিরাপদে থাকবে। আর দাঁড়ানো ব্যক্তি তা নিয়ে চলমান ব্যক্তি থেকে ভাল থাকবে। আর চলমান ব্যক্তি সে ব্যাপারে দ্রুতগামী থেকে ভাল থাকবে। (অর্থাৎ এদের প্রত্যেকেই একে অপর থেকে ভয়ানক অবস্থায় পতিত হবে। এদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক অবস্থায় সেই ব্যক্তি, যে ফিৎনার ব্যাপারে দ্রুতগামী, সে-ই তা উস্কিয়ে দেয়। তারপর হল সে ব্যক্তি যে তার কারণ সমূহ নিয়ে তৎপর থাকে। তারপর হল সে ব্যক্তি যে ফিৎনা থেকে বসে থাকে তাতে সরাসরি লিপ্ত হয় না তবে তার সমর্থন করে।) যদি এরকম ফিৎনা শুরু হয়ে যায়, তখন যার উট আছে সে যেন উটের রাখালীতে লিপ্ত হয়, যার ছাগল আছে সে যেন ছাগলের রাখালীতে লিপ্ত হয়, যার ক্ষেত-খামার আছে সে যেন চাষাবাদের কাজে ব্যস্ত থাকে। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! করো যদি উট বা ছাগল বা ক্ষেত না থাকে, তখন সে কি করবে? তিনি বললেন: সে নিজের তরবারী নিয়ে তা ভোঁতা করে ফেলবে। তারপর ফিৎনা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হলে মুক্ত থাকবে। হে আল্লাহ্ আমি কি পৌঁছিয়েছি? হে আল্লাহ্ আমি কি পৌঁছিয়েছি? হে আল্লাহ্ আমি কি পৌঁছিয়েছি? বর্ণনাকারী বলেন: সে সময় জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে যদি বাধ্য করে দু'দলের কোন এক দলে নিয়ে যাওয়া হয়? এমতাবস্থায় কোন লোক তরবারী দিয়ে আমাকে আঘাত করে অথবা কোন তীর এসে আমাকে হত্যা করে ফেলে? তিনি বললেন, সে (হত্যাকারী) নিজের এবং তোমার পাপসমূহ বহণ করবে এবং জাহান্নাম বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (ছহীহ মুসলিম)

৬) **অধিক হারে তওবা ইস্তেগফার ও তাসবীহ্-তাহলীল করা।** আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

"তিনি (ইউনূস আ:) যদি অধিকহারে তসবীহ পাঠকারীদের অন্তর্ভূক্ত না হতেন, তবে পূণরুত্থান দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই রয়ে যেতেন।" (সূরা ছাফাত- ১৪৩-১৪৪) যে কোন বিপদ শুধুমাত্র পাপাচারের কারণে নাযিল হয়। আর তা উঠিয়ে নেয়া হয় এবং তা থেকে মুক্তি দেয়া হয়, একমাত্র তওবার মাধ্যমে।

৭) **অধিক হারে ইবাদত ও সৎ আমল করা।** কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন: "যখন মানুষ বিবাদ-বিসম্বাদে (খুন-খারাবীতে) লিপ্ত হবে তখন (তা হতে বিরত থেকে) ইবাদতে লিপ্ত হওয়া, আমার নিকট হিজরত করে চলে আসার মত পূণ্যের কাজ।" (মুসলিম, আহমাদ ও তিরমিযী) সুতরাং সবধরণের ইবাদতের প্রতি বিশেষ যত্নবান হবে। কেননা ইবাদত আত্মাকে সুস্থির করে এবং মানুষকে সঠিক চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ দেয়।

৮) **ধীরস্থিরতা অবলম্বন।** আর তা সৃষ্টি হয় ছবরের মাধ্যমে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন: "নিশ্চয় তোমার মধ্যে দুটি গুণ আছে যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল পসন্দ করেন। আর তা হল: ধৈর্য ও ধীরস্থিরতা।" (মুসলিম ও তিরমিযী)

৯) **পূর্বলক্ষণ শুভ মনে করা এবং আল্লাহ্র সাহায্যের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা রাখা।** যেমনটি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) খন্দক যুদ্ধের ক্ষেত্রে খন্দক খনন করার সময় ছাহাবীদেরকে বিভিন্ন বিজয়ের ব্যাপারে সুসংবাদ দিচ্ছিলেন।

১০) **উদ্ভূত সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের প্রচেষ্টা করা।** নিরাশ না হওয়া এবং বিষয়টিকে সে অবস্থাতেই ছেড়ে না দেয়া। যেমনটি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হুনায়ন যুদ্ধের ক্ষেত্রে করেছিলেন- যখন যুদ্ধের পরিস্থিত কঠিন হয়ে গিয়েছিল। তিনি ছেড়ে দেননি, সাধ্যানুযায়ী পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করেছেন। অন্যথায় মুসলমানদের পরাজয় ঘটতো।

১১) **ফিৎনার সময় ইসলামী ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা বাস্তাবায়ন করা।** বিশেষ করে মুসলমানদের উপর কাফেরদের পক্ষ থেকে আক্রমণের সময়। এটি একটি আক্বীদাহ্ সংক্রান্ত বিষয়, যার মাধ্যমে 'ওয়ালা ও বারা' (মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব এবং কাফেরদের সাথে শত্রুতা) সুস্পষ্ট হয়।

১২) **অপপ্রচার থেকে সাবধান থাকবে এবং যে কোন সংবাদ পরিবেশন করার সময় সবাধানতা অবলম্বন করবে এবং তা যাচাই-বাছাই করে নিবে।** আল্লাহ্ বলেন: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কাছে যদি কোন পাপাচারী কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তা পরীক্ষা করে দেখবে। যাতে অজ্ঞতা বশত: তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর, এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও।" (সূরা হুজুরাত-৬) প্রচার মাধ্যমের যুদ্ধ বাস্তব যুদ্ধের চাইতে বেশী প্রভাব সৃষ্টিকারী। যেমনটি ঘটেছিল মুসলামন মুহাজেরদের ক্ষেত্রে যখন তারা মিথ্যা প্রচারের কারণে হাবশা থেকে ফেরত এসেছিলেন। এবং যেমনটি ঘটেছিল ইফ্কের ঘটনায় অপপ্রচারের মাধ্যমে।

১৩) **বিপদ-মুছীবত নাযিল হওয়ার সময় বেশী করে দু'আ করা এবং কুনূতে নাযেলা পাঠ করা।**

১৪) **ফিৎনা সম্পর্কিত হাদীছগুলোকে চলমান পরিস্থিতির সাথে না মিলানো।** একাজ হল নির্ভরযোগ্য আলেমদের। কেননা এর মাধ্যমে হাদীছকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়।

১৫) **স্বপ্নের উপর নির্ভর করা থেকে সতর্ক থাকা।** কেননা কিছু লোক স্বপ্নের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্ম পদ্ধতি নির্ধারণ করে থাকে। আর এটা হল ছূফীদের নীতি। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নীতি হল শরীয়তের দলীলের ভিত্তিতে কর্ম পদ্ধতি নির্ধারণ করা।

১৬) **আল্লাহ্ ভক্ত আলেম-ওলমাদের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখা।** যাঁরা সর্বদা হক্ব কথা বলেন এবং আল্লাহ্র কথা বলতে ও তাঁর পথে চলতে কাউকে ভ্রুক্ষেপ করেন না।

প্রশ্নমালা:

১) ফিৎনার চারটি অর্থ লিখ। দলীলসহ।

২) ফিৎনা দু'প্রকার, উদাহরণসহ উহা উল্লেখ কর।

৩) ফিৎনার কারণ সমূহের মধ্যে একটি হল 'বাড়াবাড়ি'। বিষয়টি দলীলসহ বুঝিয়ে দাও।

৪) ফিৎনার ক্ষেত্রে মু'মিন ব্যক্তির অনেকগুলো করণীয় আছে। তম্মধ্যে ছয়টি পয়েন্ট দলীলসহ উল্লেখ কর।

_____